## তিনি যে কত মানুষের মনে শান্তি যুগিয়েছিলেন! – একটি কোলাজ

অমরেন্দ্রনাথ বসু

হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথের কথাই ভাবছি। তিনি যে কত মানুষের ধনী, দরিদ্র, অসহায়, ক্ষমতাশালী, পন্ডিত, মূর্খ নির্বিশেষে মনে সারা জীবন ধরে শান্তি যুগিয়ে গেছেন তা বলে শেষ করা যায় না। তিনি সারা জীবন ধরে মানুষের মনে শান্তি ও সদর্থক ভাবনার কথাই বলে গেছেন। তিনি ছিলেন শান্তির প্রতীক। এখানে এই প্রসঙ্গে তাঁর জীবন থেকে কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরছি। ঘটনাগুলির (মাত্র কয়েকটি) মধ্য দিয়েই তাঁর ভাবমূর্তি ফুটে উঠেছে।

ঘটনা-১ : প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ। ১৯২০-১৯২১ সাল। সমগ্র ইউরোপ মহাদেশ লন্ডভন্ড। চারিদিকে তখনও ধ্বংস, বিচ্ছেদ ও বেদনার চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। পশ্চিম তখন আলোর সন্ধান করছে। রবীন্দ্রনাথ তখন পুত্র রথীন্দ্রনাথকে সঙ্গী করে ইউরোপ এবং আমেরিকা ভ্রমণ করছেন। বেশি দিনই তাঁদের কেটেছে ইংল্যান্ড ও মধ্য ইউরোপের দেশগুলিতে পরিক্রমা করে। ১৯২০ -র কোন এক সময়ে তাঁরা এসেছেন ফ্রান্সে। এই সময় রথীন্দ্রনাথের এক ফরাসী চিত্রশিল্পী বান্ধবীর কাছে তাঁরা এক গল্প শোনেন। বান্ধবীটি কয়েকদিন আগেই ইতালি গিয়েছিলেন বেড়াতে। তিনি বেড়াতে বেড়াতে ইতালির রিভিয়েরা অঞ্চলে জেলেপাড়ায় গিয়ে একদিন দেখলেন, এক জেলে তাঁর জাল রোদ্দুরে শুকোতে দিয়ে বালির ওপর তাঁর শোয়ানো নৌকার ছায়ায় বসে নিজের মনে একটি বই পড়ছেন। কৌতুলহ বশত: বান্ধবীটি জেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি এতো মন দিয়ে কি বই পড়ছেন? লোকটি চটে আগুন এবং বললেন, 'আপনি ভাবছেন আমি আজেবাজে কোন গল্পের বই পড়ছি। এই দেখুন আমার হাতে কি বই-তাগোরের লেখা 'ডাকঘর'। (পিতৃস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ)

রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' যে কত জায়গায় কত পরিস্থিতিতে কত মানুষকে, শিশু-বয়স্ক, অন্তরের আলোতে উদ্ভাসিত করেছে তার ইয়ত্তা নেই।

ঘটনা-২: ১৯৪০ সালে রবীন্দ্রনাথ কিছুদিনের জন্য কালিম্পং-এ তাঁর স্নেহধন্যা মৈত্রেয়ী দেবীদের বাড়িতে কাটিয়ে ছিলেন। এই সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে এবং হিটলার সারা ইউরোপ তছনছ করে চলেছে। জার্মান বাহিনী ফ্রান্সে ঢুকে পড়েছে এবং প্যারিসে বোমা বর্ষণ করছে প্রতিদিন। রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিন সন্ধ্যায় রেডিওতে সংবাদ শুনতেন যুদ্ধের পরিস্থিতি জানার জন্য। এই সময়কার একদিনের কথা মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে লিখেছেন– ''একদিন সন্ধ্যেবেলা তাঁর কাছে বসে আছি, তখন ঘোরতর যুদ্ধ চলছে, প্যারিসের সেদিন পরাজয় হয়েছে- নাৎসী সৈন্য ঢুকছে। কিছুদিন থেকে রোজই সবাই মিলে রেডিওর খবর শোনা হচ্ছে, খবরের কাগজ পড়া হচ্ছে, আর চলছে উত্তেজিত আলোচনা। বিশেষ করে 'মাদ্‌মোসেল বসনেক' ব'লে একটি ফরাসী মহিলা আমাদের সঙ্গে ছিলেন। ফ্রান্সের খবর তাই খুঁটিয়ে শোনা হ'ত। সেদিন গুরুদেবের শরীরটা ক্লান্ত ছিল, চুপচাপ বিশ্রাম করছেন। হঠাৎ দরজার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন– 'গুরুদেব আজ ওরা প্যারিসে 'ডাকঘর' অভিনয় করেছে, এখন।' উনি উঠে বসলেন। বেশ বুঝলাম মনের ভিতরে একটা নাড়া লাগল। 'আজ? আজ ওরা 'ডাকঘর' অভিনয় করছে?" একটু স্তব্ধ হয়ে থেকে আবার যেমন ছিলেন তেমনি শুয়ে পড়লেন, শুধু উত্তেজিতভাবে পা নাড়ছিলেন। বেশ খানিকক্ষণ পরে তিনি বলেছিলেন ''সেবারের রাশিয়াতে ওদের দারুণ দুঃখের দিনে ওরা বারবার অভিনয় করেছে 'King of the Dark Chamber' (এই নাটকটি 'রাজা' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ)। হয়ত রুশ ভাষায় অনুদিত হয়েছিল।

ঘটনা-ত: দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীভৎস তান্ডব চলছে। হিটলারের নাৎসী বাহিনী মধ্য ইউরোপের প্রায় সকল রাজ্যই দখল করে নিয়েছে। এর সঙ্গে চলছে ইহুদী হত্যা। এই হত্যার জন্য তৈরি হয়েছে নানা জায়গায় কয়েকটি 'মারণ গৃহ'। এই মারণ-গৃহের কাজ চলে সকলই যান্ত্রিক উপায়ে। আর এই কাজের দায়িত্বে থাকে নাৎসী বাহিনীর কিছু নর-পশু। পোল্যান্ডের ওয়ারশ (Warsaw) শহরে এই রকমই একটি মারণ-গৃহ অবস্থিত। বন্দীদের অন্তিম দিনে মারণ-গৃহে নিয়ে যাওয়ার কয়েকদিন আগে তদের নিয়ে যাওয়া হতো নির্দিষ্ট আর একটি বন্দিশালায়। এগুলির ইংরেজী নাম Concentration Camp. ইহুদীরা ওয়ারশ শহরের এক বস্তি অঞ্চলে (Jewish Ghetto) থাকত। ইহুদী শিশুদের বন্দিশালায় নিয়ে আসার পরে তাদের দায়িত্বে ছিলেন জানুস্ কোরচ্যাক (Janusz Korczak) নামে একজন পোল্যান্ডের ডাক্তার। কোরচ্যাক বুঝতে পেরেছিলেন যে ইহুদী শিশুদের বন্দিশালায় নিয়ে গেলে তার পরের ধাপে তাদের পাঠান হবে মৃত্যু-গৃহে মেরে ফেলার জন্য। তাই কোরচ্যাক শিশুদের মানসিক প্রস্তুতির জন্য ইহুদী বস্তিতে শিশুদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। শিশুরাই ক'দিন ধরে মহড়া দিল। তারপর অভিনয় করল। ডাক্তার কোরচ্যাক এইভাবে তাদের নিশ্চিত ভবিষ্যৎ পরিণতির জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করালেন। 'ডাকঘর' নাটকটির কী অভূতপূর্ব প্রয়োগ। (Martin Kampchen-এর প্রবন্ধ A plea for Innovation-I; The Statesman, 3 December, 2010 অবলম্বনে)।

ঘটনা-৪: একটি মর্মস্পর্শী ঘটনা এবং পুত্রহারা মায়ের হৃদয় বিদারক চিঠি। ইংল্যান্ডের এক তরুণ ইংরেজ কবি উইলফ্রিড ওয়েন (Wilfred Owen; 1993-1918) প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদান করতে বাধ্য হয়েছিলেন (ব্রিটেনে সেই সময় যুদ্ধে যোগদান বাধ্যতামূলক আইন ছিল)। যুদ্ধের প্রায় সমাপ্তির মুখে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হন। তাঁর কবিতার বিষয় বস্তু ছিল যুদ্ধের বিরোধিতা এবং ভয়াবহতা। উইলফ্রেড মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ফ্রান্স যান। তাঁর মৃত্যুর দু'বছর পরে মা রবীন্দ্রনাথকে এককানা চিঠি লেখেন। চিঠিখানির বয়ান নিচে তুলে দেওয়া হলো। বাকি কথা চিঠিই বলবে-

(চিঠিখানি অবশ্যই ইংরাজীতে। এর বাংলা অনুবাদ কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ যখন লন্ডনে অবস্থান (১৯২০ সাল) করছিলেন তখন তিনি এই চিঠি পান।

"Mahim"
Monkendor Road
Shrewsbury
1 August, 1920

শ্রদ্ধেয় স্যার রবীন্দ্রনাথ,

যেদিন শুনেছি আপনি লন্ডনে এসেছেন, সেদিন থেকে রোজই ভাবছি আপনাকে চিঠি লিখি। আজ আপনাকে আমার মনের কথাটুকু জানবার জন্য এই চিঠি লিখছি। এই চিঠি আপনার হাতে গিয়ে পৌঁছবে কিনা জানি না; কারণ আপনার ঠিকানা আমার জানা নেই। তবু আমার

মনে হচ্ছে লেফাফার উপর আপনার নামটুকুই যথেষ্ট। আজ থেকে দু'বছর আগে আমার অতি স্নেহের বড়ো ছেলে যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য ফ্রান্স পাড়ি দিল। সেই যাওয়াই তার শেষ যাওয়া। যাবার আগে আমার কাছে বিদায় নিতে এল। আমরা দু'জনেই তাকিয়ে আছি ফ্রান্সের দিকে। মাঝখানে সমুদ্রের জল রৌদ্রে যেন ঝলমল করছে। আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় আমাদের বুক ভেঙে যাচ্ছে। আমার কবি-ছেলে তখন আপন মনে আপনার লেখা কবিতার সেই আশ্চর্য ছত্রগুলি আউড়ে চলেছে–

যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই-

যা দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই। ইত্যাদি

তার পকেট-বই যখন আমার কাছে ফিরে এলো, দেখি তার নিজের হাতে এই কথা লিখে তার নিচে আপনার নাম লিখে রেখেছে। যদি কিছু মনে না করেন, আমায় কি জানাবেন আপনার কোন বইয়ে কবিতাটি পাওয়া যাবে?

এই পোড়া যুদ্ধ থামবার এক সপ্তাহ আগে আমার বক্ষের ধন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিল। যেদিন যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হল, সেদিন এই নিদারুণ খবর এসে পৌঁছল আমাদের কাছে। আর কিছুদিন পরেই আমার ছেলের একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হবে। এই বইয়ে থাকবে যুদ্ধের বিষয়ে লেখা তার কবিতা। দেশের অধিকাংশ লোক নিশ্চিন্ত আরামে দেশে বসে আছে, যুদ্ধক্ষেত্রে যারা অশেষ দুঃখকষ্ট বরণ করছে, এমন-কি প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে, তাদের জন্য কোনো মমতা বা অনুভূতি নেই– একথা ভেবে বাছা আমার ভারি মনোবেদনা অনুভব করত। যুদ্ধে যে কোন পক্ষেরই কোন লাভ নেই- এ বিষয়ে তার সংশয় মাত্র ছিল না। কিন্তু নিজের দুঃখ-কষ্ট সম্বন্ধে সে একটি কথাও বলেনি তার কবিতায়। যারা তাকে ভালবাসত তারাই বুঝবে-কী গভীর দুঃখ ছিল তার মনের মধ্যে। তা না হলে এরকম কবিতা সে লিখতে পারত না। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র পঁচিশ বছর। সে ছিল সৌন্দর্যের উপাসক -তার নিজের জীবন ছিল সুন্দর, কল্যাণময়। আমি অভিযোগ করব না, ভগবান যখন তাকে টেনে নিলেন, ভালোবেসেই নিয়ে গেছেন। আমার মায়ের প্রাণ, আমি নিয়ত তাঁর কাছে কত প্রার্থনাই করেছি। তিনি প্রেমময়, তিনি যদি ভালো বুঝতেন তা হলে তো মায়ের কোলেই সন্তানকে ফিরিয়ে দিতে পারতেন। সুতরাং আমি নতমস্তকেই তাঁর বিধান মেনে নিয়েছি। যতদিন এ জগতে আছি, কোনো অভিযোগ না করে নীরবে কাটিয়ে যাব। আমাদের ত্রাণ করার জন্য যিনি মানুষের রূপ ধরে এসেছিলেন, তিনি আমাদের জন্য এক অমৃতলোক রচনা করে রেখেছিলেন। সেই খানে আমার উইলফ্রেডের সঙ্গে আমি আবার মিলিত হব। আমি যখন চিঠি লিখতে শুরু করি তখন ভাবিনি এত কথা লিখব, চিঠি বড়ো হয়ে গেল বলে আমায় মার্জনা করবেন। আপনি যদি আমার ছেলের কবিতার বইখানি পড়েন, ভারি অনুগৃহীত বোধ করব। চ্যাটো অ্যান্ড ইউনডাস শরৎকালের মধ্যেই বইখানি বের করবে। যদি অনুমতি দেন আমি একখানি বই আপনাকে পাঠিয়ে দেব।

আমার গভীর শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। ইতি–

ইউলফ্রেড ওয়েনের মা

সুজান এইচ ওয়েন।

(বিঃদ্রঃ - ইউলফ্রেডের নোট বইতে ইংরেজী 'গীতাঞ্জলী'-র ৯৬ নং গানটি লেখা ছিল- "When I go from hence Let this be my parting word, that what I have seen is unsurpassable."etc.)

ঘটনা-৫ : রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারি পতিসরে শেষবার যান ১৯৩৭ সালে। তিনি সেখানে জমিদারি দেখাশোনার জন্য কাজ আরম্ভ করেন ১৮৯১ সালে। তিনি জমিদারি দেখার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে সেখানকার নিয়ম-কানুনের অনেক পরিবর্তন করেন। পুণ্যাহের মিলন উৎসবে বসার ব্যবস্থায় বহুদিনের প্রচলিত রীতি, জমিদারবাবু সিংহাসনে বসবেন, প্রজারা বসবেন ভূমিতে শতরঞ্চির উপরে; একদিকে হিন্দু প্রজা আর একদিকে মুসলমান প্রজা। এই ব্যবস্থা দেখে রবীন্দ্রনাথ বলেন– ''প্রাচীন প্রথা আমি বুঝিনা, সবার একাসন করতে হবে। জমিদার হিসাবে এই আমার প্রথম হুকুম।" রবীন্দ্রনাথের জমিদারির কাজ শুরু এই পুণ্যাহের অনুষ্ঠান দিয়ে।

প্রাচীন প্রথায় আস্থাবান নায়েব এবং অন্যান্য হিন্দু আমলারা রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন প্রথা ভঙ্গের সিদ্ধান্তে ক্রুদ্ধ হয়ে ঘোষণা করলেন প্রথার পরিবর্তন ঘটালে তাঁরা পদত্যাগ করবেন। কিন্তু রবীন্দ্রাথ তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় রইলেন। তিনি প্রজাদের উদ্দেশ্যে বললেন, ''এই মিলন উৎসবে পরস্পরের ভেদ সৃষ্টি করে মধুর সম্পর্ক নষ্ট করে দেওয়া চলবে না। প্রজারা তোমরা সব পৃথক আসন, পৃথক ব্যবস্থা -সব সরিয়ে দিয়ে একসঙ্গে বসো। আমিও বসব। আমি তোমাদেরই লোক।" তারপর তিনি সকল কর্মচারী এবং নায়েবদের ডেকে এনে উৎসব শুরু করলেন। সেদিন থেকে জমিদারির পূণ্যাহ সভায় শ্রেণীভেদের ব্যবস্থা উঠে গেল। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এক নতুন সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন থেকে।

১৯৩৭ সালে পতিসর থেকে শেষ বিদ্যায়ের দিনটিও ছিল পুণ্যাহের উৎসবের দিন। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে পল্লী উন্নয়নের, সমাজ সংস্কারের, কৃষি ব্যবস্থার প্রভৃতির অনেক মৌলিক কাজ করেছেন। কোনো কোনো পল্লীতে তিনি যথার্থ এবং যথেষ্ট উন্নতি বিধানে সমর্থ হয়েছিলেন।

পূণ্যাহের অনুষ্ঠানের পর রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানাবার পালা। জমিদার ও প্রজারা সকলেরই আনন্দের শেষ নেই। কালীগ্রাম পরগণার প্রজাবৃন্দের পক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি ও অভিনন্দন পাঠ করেন মোঃ কফিলুদ্দিন আকন্দ রাতোয়াল। তিনি রবীন্দ্রনাথের শুভাগমন উপলক্ষে বলেন-

''প্রভু রূপে হেথা আস নাই তুমি/ দেবরূপে এসে দিলে দেখা/ দেবতার দান অক্ষয় হউক/ হৃদিপটে থাক্ স্মৃতি রেখা।"

রবীন্দ্রনাথ উত্তরে বলেছিলেন : ''সংসার থেকে বিদায় নেবার সময় তোমাদের সঙ্গে দেখা হল- এইটিই আমার সান্ত্বনা। তোমাদের কাছে অনেক পেয়েছি-কিন্তু কিছু দিতে পেরেছি বলে মনে হয় না। সেসব কথা মনে হলে বড় দুঃখ পাই। কিন্তু আমার সময় নেই, আমার যাবার সময় হয়েছে, শরীর আমার অসুস্থ-এ অবস্থায় তোমাদের মধ্যে এসে, তোমাদের সঙ্গে থেকে তোমাদের উন্নতির জন্য কিছু করবার ইচ্ছা থাকলেও, আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। তোমরা নিজের পায়ে দাঁড়াও, তোমাদের সবার মঙ্গল হোক–তোমাদের সবাইকে এই আশীর্বাদই আমার শেষ আশীর্বাদ।"

কবির কথা শুনে সবাই বিচলিত, সকলের চোখ ছলছল। একজন বৃদ্ধ মুসলমান প্রজা রবীন্দ্রনাথকে বললেন, ''আমরা তো হুজুর বুড়ো হয়েছি, আমরাও চলতি পথে; বড়ই দুঃখ হয়, প্রজা-মনিবের এমন মধুর সম্বন্ধের ধারা বুঝি ভবিষ্যতে বন্ধ হয়ে যায়।"

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ''তোমরা আমার বড়ো আপনজন, তোমরা সুখে থাকো।" প্রজারা নীরব।

খানিক থেমে রবীন্দ্রনাথ আবার বললেন: তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারিনি। ইচ্ছে ছিল মান সম্মান সম্ভ্রম সব ছেড়ে দিয়ে তোমাদের সঙ্গে তোমাদের মতই সহজ হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেব। কী করে বাঁচতে হবে তোমাদের সঙ্গে সেই সাধনা করব, কিন্তু আমার এই বয়সে তা

হবার নয়, আমার যাবার সময় হয়ে এসেছে। এই নিয়ে দুঃখ করে কী করব? তোমাদের সবার উন্নতি হোক - এই কামনা নিয়ে আমি পরলোকে চলে যাব।"

এই দিনের সভায় কবির সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তাঁর একান্ত সচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, কবির শ্যালক নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, ভৃত্য বনমালী এবং সেই সময়কার রাজশাহীর জেলাশাসক অন্নদাশঙ্কর রায়।

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী এই প্রসঙ্গে বলেছেন– ''অতীতের পুরানো কথা বলতে বলতে কবি এবং প্রজাদের চোখ ছলছল করে উঠেছে আনন্দের অশ্রুবাষ্পে। এ দৃশ্য দেখতে পাব কোনোদিন ভাবতে পারিনি। সাম্প্রদায়িক এই দুর্দিনে পতিসরে মুসলমান বহু প্রজামন্ডলীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আসন কোথায় সেটা চোখে যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা বুঝবেন - চোখে যাঁরা দেখেন নি, তাঁদের সে কথা লিখে বুঝিয়ে বলা শক্ত।"

কবির বিদায়ের সমস্ত উপস্থিত। বোট প্রস্তুত। বোট ছাড়বে এখনই। কবি সকলকে শেষ নমস্কার জানালেন করজোড়ে।

(তথ্যসূত্র: একত্রে রবীন্দ্রনাথ, অমিতাভ চৌধুরী, ১৯৮৩ এবং রবীন্দ্র জীবনী, চতুর্থ খন্ড, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়)

ঘটনা-৬ : রবীন্দ্রনাথ ১৯২১ সালে ইউরোপ ভ্রমণ করছিলেন। তিনি ১৯২১ -এর জুন মাসে জার্মানির ডার্মস্টাট শহরে এক সপ্তাহ কাটান। ঐ সপ্তাহকে (৯ থেকে ১৪ জুন) সেখানকার কতৃপক্ষ Tagore Woche, অর্থাৎ ঠাকুর সপ্তাহ আখ্যা দিয়েছিলেন। এখানে কবি নানা বিষয়ে অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেখানে ডিউক প্রাসাদে অবস্থান করছিলেন। প্রাসাদে কাইজার পরিবারের অনেকেই ছিলেন। কাইজার পরিবারের এক ছেলে কবিপুত্র রবীন্দ্রনাথকে (এই সফরে রথীন্দ্রনাথ সঙ্গী ছিলেন) ধরলেন তাঁকে কবির কাছে নিয়ে যেতে, তিনি কবির সাথে একান্তে কথা বলবেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে গেলে তিনি একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন এবং ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে লাগলেন। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''কঠোর হৃদয় একজন জার্মান যে ভাবাবেগে এমন অভিভূত হতে পারেন, এ আমার ধারণার অতীত ছিল। সাক্ষাতের পর তিনি বাবাকে একটি বিশেষ ডিজাইনের ফুলদানি উপহার দিলেন, বললেন–ফুলদানিটি ওঁর অন্তরাশ্রিত ভাবের দ্যোতক।" ( পিতৃস্মৃতি, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৯৫ বাং)

ডার্মস্টাট শহরে আর একটি ঘটনা ঘটেছিল যা অভাবনীয় এবং তা জার্মান শ্রমিকদের হৃদয়ে কত যে প্রশান্তি এনে দিয়েছিল তার সাক্ষ্য বহন করে। ডার্মস্টাট একটি শিল্পকেন্দ্র। সেখানকার শ্রমিক সংঘ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল যে, শ্রমিকরা তাঁদের মধ্যে কবিকে একবার পেতে চান। শিল্প-শ্রমিকরা যদিও আচার-আচরণে ও শিক্ষায় আদর্শ মানুষের মতো ছিলেন না তথাপি রবীন্দ্রনাথ একদিন তাঁদের ক্লাবে উপস্থিত হলেন। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তৃতীয় খন্ডে (রবীন্দ্রজীবনী, ১৯৬১) লিখেছেন-''শ্রমিকরা তাঁহাকে (কবিকে) কোনো সম্মান দেখাইবার জন্য ঔৎসুক্য দেখাইল না। বীয়ারের বোতল সম্মুখেই থাকিল, চুরুটের ধোঁয়া যথাপূর্ব কুন্ডলিত হইয়া চলিল-কবি তাঁহাদের মধ্যে গিয়াই বসিলেন। ধীরে ধীরে কথা শুরু করিলেন এবং যেমন সেগুলি অনুদিত হইতে লাগিল সভার শ্রোতাদের ব্যবহারে পরিবর্তন যুগপৎ লক্ষিত হইল। কিছুক্ষণের মধ্যে বীয়ারের মগ বেঞ্চের নীচে গেল, চুরুট নিভাইয়া লোকে পকেটে পুরিল, ঋজু হইয়া স্তব্ধভাবে সকলে বসিল। কবি বলিয়াছেন– জীবনে তাঁহার এত বড়ো বিজয় কোনো দিন হয় নাই।

ঘটনা-৭ : জার্মান পদার্থ বিজ্ঞানী আর্নল্ড সামারফেল্ড (arnold Sommefeld) এবং তাঁর এক প্রাক্তন ছাত্র হাইজেনবার্গ (Warner Heisenberg) ভারতে এসেছিলেন যথাক্রমে ১৯২৮ এবং ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে। সামারফেল্ড শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সাথে বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি পরে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং তাতে তিনি কবি জার্মান মহাকবি ও মহাজ্ঞানী গেটে-র (Goethe) সাথে তুলনা করেছিলেন।

ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ ভারতে এসে হঠাৎ একদিন কলকাতা বিজ্ঞান কলেজে হাজির হন। পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং ছাত্রছাত্রীরা এই স্বনামধন্য বিজ্ঞানীর হঠাৎ আগমনে হতভম্ব হয়ে তাঁর সাথে আলাপ আলোচনার এবং আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। তাঁকে মধ্যাহ্নভোজের জন্য নিয়ে যাওয়া হলে ফিরপো হোটেলে। সেখানে ভোজনান্তে উদ্যোক্তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের সাথে-দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন জোড়াসাকোঁর বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। উদ্যোক্তারা কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের সাথে যোগাযোগ করে হাইজেনবার্গের এই ইচ্ছার কথা জানালেন। রথীন্দ্রনাথ সেই দিনই সন্ধ্যায় তাঁকে তাঁর পিতার সাথে চা-পানের আমন্ত্রণ জানালেন। নির্ধারিত সময়ের কবি ও বিজ্ঞানীর সাক্ষাৎ এবং একান্ত দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়েছিল।

হাইজেনবার্গ হলেও পদার্থবিদ্যার কোয়ান্টাম তত্ত্বের (Quantum Theory) অনিশ্চয়তা নীতির (Uncertainty Principle) আবিস্কর্তা। তিনি তাঁর অবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু এ যুগের মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন পদার্থ বিজ্ঞানে এই বৈপ্লবিক 'অনিশ্চয়তা নীতি' মেনে নিতে পারেন নি। এতে হাইজেনবার্গ তাঁর চিন্তাধারার যথার্থতা সম্বন্ধে গ্রহণ করলেন। ভারতীয় চিন্তাধারায় যদি এ সম্বন্ধে কিছু সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের সাথে হাইজেনবার্গের উক্ত আলোচনার ফল সম্বন্ধে কিছুটা বিবরণ পাওয়া যায় অধ্যাপক ফ্রিটজোফ কাপরা-র (Fritjof Campar) 'Uncommon Wisdom : Conversation with Remarkable Peole' (1988) গ্রন্থে। কাপরা লিখেছেন : this introduction to Indian thought brought Heisenberg great comfort, he told me. He (Heisenberg.) began to see that that recognition of relativity, interconnectedness, and impermancnce as fundamental asecet of physical reality, shich had been so diffcult for himself and his fellon physicisis.was the very bassis of India spiritul traditio. After this conversation and Tagor." he said, "Some of the ideas that had seemed so crazy suddenly made much more sence. That was a great help for me.

কৃষ্ণা দত্ত এবং এনড্রু রবিনসন (Krishna Dutta & andrew Robinson সম্পাদিত 'Selected letters of Rabindranath Tagore' (2005) গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে হাইজেনবার্গ তাঁর এক ছাত্র, Helmut Rechenberg–এর কাছে এই আলোচনার বিষয়টি কয়েকবার উল্লেখ করেছিলেন। Rechenberg তা নথিবদ্ধ করে Munich- এর Max lank Institute -এ রক্ষিত অবস্থায় রেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথ যে কেবল অসংখ্য সাধারণ মানুষের জীবনে শান্তি যুগিয়েছিলেন, তাই নয়; তিনি প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক মনেও শান্তির বারি সিঞ্চন করেছিলেন। নানা মৈত্রী ও প্রেম ভাবনায় রবীন্দ্রনাথের একটি কোলাজ (Collage) চিত্র।